সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট’ প্রসঙ্গে

ধীমান সান্যাল

বাংলা ছোট গল্পে ‘গল্প বলা’-র ধরণ মূলত চার-পাঁচটি ধারায় বিভক্ত। অবশ্যই আলোচনায় আনছি না ষাটের গল্পহীন গল্পের ধারাকে। স্বীকার করতে বাধা নেই, এই প্রকোষ্ঠগুলো প্রচুর ফাঁকফোকর যুক্ত; ফলতঃ এক ঘরের আলো বাতাস অন্য ঘরে যাতায়াত করে। তাই, ছোটগল্পের ধারার অ্যাকাডেমিক আলোচনাও যথেষ্ট উত্তেজক। প্রথম ভাগকে যদি সোপানারোহ গঠন stair-step construction বলা যায় তবে সিঁড়ি দিয়ে ক্রমশ ওঠার ব্যাপারটা ধরা যাবে হয়ত। এই ভাগে অবশ্যই বাংলা ছোটগল্পের অনেক দিকপাল, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র সেন, সতীনাথ ভাদুড়ী, সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দু হয়ে আজকের অনেকেই। গল্প এখানে ধীর গতিতে গড়ে ওঠে; অনেকটা সিঁড়ি ভাঙার মত। যেহেতু এই পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের প্রাচীন কথকথার মিল আছে, তাই অভ্যাস সাপেক্ষ অনেকেই এই ধরণের গল্প পাঠে অনায়াস পাঠ-সুখ পান। এই অতি পরিচিত রাস্তায় বাণিজ্য সফল অনেক লেখকের নিরাপদ যাত্রা। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তুলনায় কিছুটা জটিল, একে চকিতোন্নত গঠন Rocket construction বলা যাবে, এই পদ্ধতিতে ছোট গল্পের সূচনা হয় একটা তুঙ্গ মুহূর্ত থেকে, crisis থেকে। এই তুঙ্গ মুহূর্ত থেকে লেখকরা সুকৌশলে কাহিনীকে রসসিদ্ধ পরিণতি দেওয়ার চেষ্টা করেন। ধরা যাক, সুবিমল মিশ্র কিংবা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথা। সমকালে সব থেকে চর্চিত রীতি হল, ঘূর্ণরেখা গঠন circular construction। এ পদ্ধতিতে কাহিনী রেখার চারপাশে থাকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের নানা অবয়ব; চরিত্র-পরিবেশ মিলিয়ে একটি বৃত্ত সৃষ্টি হয়। মহাশ্বেতা-দীপেন্দ্রনাথ-দেবেশ-অমর-স্বপ্নময়-কিন্নর-ভগীরথ-শচীন-আফসার, আরও অনেকেই এই পদ্ধতিই মূলত অনুসরণ করেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় সত্তরে এই পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর পদ্ধতির দিকে ঝুঁকেছেন। বস্তুত পক্ষে আট দশকের থেকে বাংলা ছোটগল্পে চতুর্থ ঘরানার চর্চা ব্যাপকভাবে শু, একে মিশ্র ঘরানা Mixed Construction বলা যাবে, হয়ত বা। সাধন ছাড়াও অনেক অনুসন্ধানী লেখকরা ইতিমধ্যেই সোপনারোহ গঠন ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারা কিংবা তৃতীয় ধারার দিকে ঝুঁকে গেছিলেন। আগেও এ’বিষয়ে কিছুটা এগিয়ে ছেলেন কমলকুমার, দীপেন্দ্রনাথ, হাসান আজিজুল হক। বলা চলে, বাংলা ছোট গল্পের উজ্জ্বল ত্রয়ী ‘বিভূতি-মাণিক-তারাশংকর’ গল্প লিখেছেন আংশিক মিশ্র রীতিতে। অন্তত, এই তিন জনের বেশ কয়েকটি গল্পে এই পদ্ধতি-প্রয়োগের লক্ষণ বর্তমান। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিভূতির যাতায়াত সোপানারোহ গঠনশৈলী থেকে ঘূর্ণরেখা গঠনের মাঝামাঝি। সাধনের ৭২ সালে লেখা ‘ ঢোল সমুদ্র’ ও তখনকার আরও কিছু গল্পে সোপানারোহ পদ্ধতির ব্যবহার (‘চবিবশ ফুট’ গল্পেও তাই) লক্ষ করা যায়। এরপরই সাধন অতি দ্রুত চকিতোন্নত গঠন ছুঁয়ে দশকের প্রায় গোড়া থেকেই মিশ্র গঠনরীতিতে গল্প লেখার চর্চা শু করেন। গল্পকার হিসেবে সাধন প্রায় সাড়ে তিনশ গল্প লিখেছেন, যার মধ্যে বিগত কুড়ি বছরে তিনি অন্তত একশ গল্প লিখেছেন এই মিশ্র রীতিতে। তাঁর ক্ষেত্রে লেখার শৈলীটি সোপানারোহ পদ্ধতি ছুঁয়ে একই সঙ্গে চকিতোন্নত গঠন পদ্ধতি আর ঘূর্ণরেখ গঠন পদ্ধতি অনুসারি; এই দুই পদ্ধতি আয়ত্তীকরণের মাধ্যমে মিশ্র গঠন শৈলীর চর্চা।

আলোচ্য গল্প ‘ জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট’ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত। গল্পটির শু হচ্ছে, ‘দ্বিতীয় রক্তপাতের ঠিক ১৪ ঘন্টা আগে ওর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।’ বাক্যটি দিয়ে। তারপর স্পেস্। হঠাৎই পাঠক অনেকগুলো প্রশ্নের সামনে। দ্বিতীয় রক্তপাতের ঘটনাটি কী? কেন ঘটল? প্রথম রক্তপাতের ঘটনাটাই বা কী? কার সঙ্গে সাক্ষাৎ? ইত্যাদি।

এই হল চকিতোন্নত গঠন পদ্ধতির অদ্ভুত জাদু। এতগুলো প্রশ্ন মাথায় পাঠকের সক্রিয়তা শু। বোধ করি, পাঠকের চিন্তার জন্যে সুযোগ করে দিল স্পেস্‌টা। বর্তমানের অনেক কথাশিল্পীর রচনায় স্পেস্‌ কবিতার মত তাৎপর্য দিয়ে আসে। সাধন ছাড়াও এ' বিষয়ে অলোক গোস্বামী, সোহারাব হোসেন, শুভংকর গুহ, সুকান্তি দত্ত, স্বপন সেন উল্লেখযোগ্য।

অম্বুজাক্ষ প্রধান, ধলঘাটের এম. পি আর কলকাতা থেকে কবি সম্মেলনে কবিতা পড়তে যাওয়া তিন যুবক ও একজন যুবতী এ' কাহিনীর অন্যতম প্রধান পাত্র-পাত্রী। কবি ভূজেন্দ্র কলকাতায় ফিরে এসে চিঠি লিখছে (সাধু ভাষায়) অম্বুজাক্ষকে। চিঠিতে ক্রিয়াপদগুলো সাধু দু'একটি শব্দ সাধু, কোথায় চলতি ইংরেজি শব্দ, অতি চলতি শব্দ প্রয়োগ ঝাঁকুনি দিকে যায়। গল্পটিতে বারে বারে চিঠির অংশ ও ন্যারেশান ব্যবহৃত হয়েছে। অতীতকে বর্তমানের দৃষ্টি দিয়ে আর স্থির অতীতরূপে দেখার এই ' টেকনিক' বাস্তবিকই বিরল ঘটনা। চিঠি, ন্যারেশান, ডায়লগ পাশাপাশি আবহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনিবার্যতায় যুক্ত হয়েছে। ঘূর্ণরেখা গঠন শৈলীর প্রয়োগে এখানে এসেছে স্থির অতীত, মানব চরিত্র, জ্যোৎস্না, এমন কী প্রান্তরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটাও, আর বহু মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব, যা বস্তুতপক্ষে সমাজকে চিহ্নিত করেছে। এম. পি-র হাতের রহস্যময় এ্যারিস্টোক্রেট। ভূজেন্দ্রর চিঠির ভাষায় ' কে ভাবতে পারছে ভারতের প্রত্যন্তে ধলঘাট বাসস্ট্যান্ডে ফাল্গুনের সাড়ে তিনটায় যিনি দাঁড়িয়ে হাল্কা মুডে পান চিবোচ্ছেন, যার পোশাক বলতে ফর্সা, ইস্তিরিপাটের খদ্দরের পাঞ্জাবি এবং ধুতি.... মেদের পার্টিসাপটায় বিট-গাজর ও শশাপিঁয়াজ পাকানো পরোটা মনে হয় যাকে, সরকার পতনের সম্ভাব্য বিস্ফোরণের আগে কানাচের টাইমবমের মতো সাধারণ মানুষটি সেজে দাঁড়িয়ে আছেন।' ভূজেন্দ্র কবি কিন্তু আধুনিক, সে লেখে 'দীর্ঘ গতিপথে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুই পাশের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে নিবিড় হইয়াছিল।' আবার টিউবওয়েলের জলের ধারাকে 'হাইপারবোলিক' বিশেষণ দেয়।

চিঠিতেই জানা যায় কবি সম্মেলন করে ফেরার সময় ধলঘাট থেকে একই বাসের যাত্রী, এম. পি. আর কলকাতার কবিরা। ভূজেন্দ্র খানিকটা গায়ে পড়া হয়ে কথা চালায় এম. পি.-র সঙ্গে। নদীর পরিচয় দেওয়ার ফাঁকে, এম. পি. যথারীতি নিজেকে জাহির করে। কবির দৃষ্টিতে 'আপনার চক্ষুর দানা দুইটিতে গ্রাম্যধূর্ততার প্রলেপ থাকিলেও, পাতাযুগল মেদে ফুলিয়ে মানুষের প্রতি ক্ষমার্হ দৃষ্টি প্রতীয়মান হয়।' তণ কবি ভূজেন্দ্র আর এম. পি অম্বুজাক্ষের পারস্পরিক কথাবার্তা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতা-অবাস্তবতার সীমারেখা ভেঙে দেয়। ডেভেলাপমেন্ট বোঝাবার জন্য এম. পি বলেন, এখন হাটের দোকানে লিপস্টিক বিক্রি হয়। কানে কানে ভূজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে 'কনডোম?' এম. পি ইংরেজিতে উত্তর করেন, 'আপনি কি মনে করেন ও ব্যবহারের বিশেষ অধিকার উচচবিত্তরাই ভোগ করবে?' এরপর মদের প্রসঙ্গ ওঠে। পরত খুলতে থাকে এম. পি-র, জিজ্ঞাসা করে ' লোভ কেবল আমাদের জন্যই অন্যায়?' বাসযাত্রার মধ্যেই শহুরে কবি আর গ্রামের এম. পি-র চরিত্ররেখা আঁকা হয়। হ্যাঁ, বাস্তবতা-অবাস্তবতার ঊর্দ্ধে উঠে। কিংবা রিলেটেড বাস্তবতার দিকে আঙুল উঁচু করে।

সাধন এই গল্পে চিঠির অংশের সঙ্গে মিশিয়েছেন 'ফ্লাশ ব্যাক' প্রথাকে। অনেকটা চলচিচত্র নির্মাণের দক্ষতায়। টুকরো টুকরো অংশ জুড়ে। জানা যায়, গত রাতে সার্কিট হাউসে কবির দল দেদার মদ্যপানের পর নিজেদের মধ্যে ক্যাচাল করেছিল। কবিতা পড়ার পর কে বেশি হাততালি পেল, সেই গোপন ঈর্ষা নেশাতুর কবিদের দেহ থেকে চুঁইয়ে পরিশেষে মারামারি। এই গল্পের প্রথম রক্তপাত ঘটায়। মার খাওয়া বন্ধুকে হিঁচড়ে টেনে বারান্দায় সারা রাত ফেলে রাখতেও তাদের বাঁধেনি। এইভাবে, গল্পের চরিত্রদের মুখোশ খুলেছেন সাধন, অবশ্যই প্রচ্ছন্নে থেকে।

তারপর সেই ট্রেন যাত্রা। পাশাপাশি কুপে কবিরা আর এম. পি। লাইনে অন্য ট্রেন উলটে যাওয়ার জন্য জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া প্রান্তরে দীর্ঘক্ষণ যাত্রা বিরতি। গতরাতের ঘটনা ভুলে কবিরা আবার যারপরনাই বন্ধু। থেমে থাকা ট্রেনের জানলা দিয়ে চাঁদে ভাসা মাঠ তাদের ডাক দেয়, এতক্ষণে কবিদের সঙ্গে এম. পি-র সম্পর্ক একরৈখিক হয়ে গেছে। কাজেই এম. পি-কে মাঠে নেমে বসতে অনুরোধ করে ভূজেন্দ্র। এম. পি আমতা আমতা করায়

‘তখন আপনার পাঁজরে কাতুকুতু শু করিলাম।

--এই যা! কী হচ্ছে মাইরি! বলিয়াই আপনি ত্রমাগত গুট্‌লি পাকাইতে লাগিলেন। অবশেষে সমস্ত প্রতিরোধ বিসর্জন দিয়া পাঞ্জাবি চাপাইয়া বলিলেন-- বাসের পরিচয় যে এত ঘনিষ্ঠ হবে বুঝিনি।...সঙ্গে কিছু নিয়েছেন?

--না।

--এটাও আমার ওপর? বেশ, এক্সপোর্ট বস্তু খাওয়াব।...শর্ত হাকুশ গিলবেন না...রয়ে সয়ে সিপ্‌ দেবেন।’

রৈখিক সম্পর্ক এখানে ছিন্ন হয়, কবিরা আর এম. পি স্থাপিত হয় একটি অব্যর্থ বিন্দুতে। শু হয় ‘ জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট’। মদ আর জ্যোৎস্না, বকে যায় এম. পি, বিবিধ প্রসঙ্গে। আর তাতেই সম্পূর্ণ হয় একটি বৃত্ত, অজান্তে। যার বিন্দুতে বিন্দুতে স্থাপিত হয় কবিরা, এম. পি অম্বুজাক্ষ, গোলাপের গন্ধ,মদ্যপান, আমের ফলন, আর অচেনা আবছা মানুষজন। ঘূর্ণরেখ পদ্ধতিতে গল্প রচনার চূড়ান্ত উদাহরণ হয়ে ওঠে গল্পটি। ‘রাত তখন মধ্যপ্রহরে। ইতিমধ্যে অনেক পার্টিই ট্রেন হইতে না মিয়া জ্যোৎস্নায় হাওয়া খাইতেছে। যেন মহাকাশযান হইতে অন্য গ্রহে পায়চারির অভিজ্ঞতা লইতেছে।’ জানা যায় এম. পি-র অম্বল আছে, অর্শ আছে, পিঠে নার্ভের যন্ত্রণা আছে। জানা গেল, এম. পি আর পাঁচটা সাধারণের মতই অদৃষ্টবাদী আর এখানেই সাধন অতি কৌশলে, সকলের অজান্তে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের একটি চিঠি পোস্ট করে দেন অক্ষরের ফাঁকে। বর্হিজগতের গল্প বৃত্ত গঠন করে, আর তার কেন্দ্রে ত্রমশ স্পষ্ট হয় অন্তর্জগতের সন্ধান।

এ’কথা ঠিক এ কৌশলে গল্প বলার ক্ষেত্রে এখন সাধন আরও ক্ষুরধার তবুও আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে এই গল্পটি, আমার বিশ্বাসে তৎকালীন ছোটগল্পচর্চার এক দিক-চিহ্ নির্দেশ করে। সাহিত্যে এ দাবী চলে না যে, এই পথই চরম। কিন্তু ব্যক্তির সৃষ্টির ক্ষেত্রে, সাহিত্য ধারায় বাঁকগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। আর আশ্চর্য এই যে, অনেক কবি-কথাসা হিত্যিক নিজেও বাঁকের সন্ধান পাওয়ার পরও দোটানায় থাকেন, কেউ কেউ তো আবার আগের শৈলীতে ফিরেই অ াসেন। সাধন এই গল্পের পরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে রচনা শৈলীগত দিক থেকে আবার পিছন থেকে শু করেছেন। আবার ফিরে এসেছেন (বিশেষ করে ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে) এই মিশ্র গঠনশৈলীতে গল্প রচনা করার কাজে। অভিজ্ঞতার ক ারণে সাধন নিছক চটকদারী গল্প লেখেন না, কিন্তু ‘ জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট’ গল্পের তীব্র স্যাটায়ারকে অনেক সময় অচর্চিত দেখে পাঠক হিসেবে আমি তো কিছুটা অভিমানী হই, সাধনের উপর।

গল্পে, অবশেষে ট্রেনটি ছাড়ে। ‘জোয়ারে নৌকা খোলার মতো, জ্যোৎস্নায় গুঞ্জন শুনিতে বুঝিলাম ট্রেন ছাড়িবে।’ সকালে ট্রেন যখন শহরের প্লাটফর্মে থামল তখনই জানা গেল দ্বিতীয় রক্তপাতের ঘটনাটা, একেবারে শেষ কয়েক লাইনে। চকিতে ান্নত গঠনশৈলীর এ এক চমৎকার প্রয়োগ। জানা গেল গত রাতে ট্রেনের অনেক বগিতে ডাকাতি হয়ে গেছে ‘চম্পট দিয়েছে সোনা-দানা, সম্পত্তি নিয়ে। শিশুর রক্ত, বৃদ্ধের জখম, মেয়েদের কোপ খাওয়া কাটা আঙুল, কনুই। একটি শিশুর পুরো কানটা ফালি দিয়ে সোনা নিয়ে গেছে। এখন মায়ের কোলে মরণ-বাঁচন শঙ্কায়। রক্তের ভূমিকম্পে হিক্কা উঠেছে।’ কী তীব্র রক্তপাতের ঘটনা অথচ এই ঘটনা যখন ঘটছে তখন জ্যোৎস্নালোকিত মাঠে, এই গল্পের প্রধান চরিত্ররা মদ্যপানরত, সমাজ-সচেতন বলে পরিচিত কবিরা, সমাজকর্মী বলে স্বীকৃত এম. পি!

গল্পটি শেষ হচ্ছে অমোঘ একটি বাক্য দিয়ে, অবশ্যই তার আগে ছাড়া আছে কিছু সাদা, স্পেস্‌। ‘শব্দটা তলিয়ে গেল। সমস্ত স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, আনাচ-কানাচ গন্ধে ভরে উঠেছে। নিশ্চয়ই কাছে পিঠে গোলাপের বাগান আছে!’

এম. পি অম্বুজাক্ষ জ্যোৎস্নায় ট্রেন লাইনের পাশে বসে গোলাপের গন্ধ পেয়েছিলেন। তখন সে গন্ধের তাৎপর্য ছিল অন্য, দ্বিতীয় রক্তপাতের পর গোলাপের গন্ধ, সেই রক্তাক্ত পরিবেশে অনুভব করেন; গল্পের পাত্র-পাত্রীরা না, পাঠক। সাধন একটা সূত্র উপস্থিত করেন, একটু আগেই যে যন্ত্রণাদীর্ণ সহযাত্রীদের ফেলে এম. পি চলে গেছেন, রাজকাজে। অমোঘ অস্ত্রের মত স্যাটায়ার! কী নির্মাণ শৈলী, কী বাক্য প্রয়োগ, ‘ জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট’ গল্পটি কথাসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে, এ’ বাংলায়, একটা ঝাঁকুনি, একটা বাঁক।

এরপর নীরবতাই সত্য হয়ে ওঠে। যে যার মত ভাবতে পারে। অথবা আবার পুনর্পাঠ ‘ জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট’-এর। এ’ রকম চলতেই থাকে কয়েক দিন, অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল।

অধিকাংশ বাংলা ছোটগল্পের একরৈখিকতার মধ্যে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের বহু গল্প ব্যতিক্রমী তার প্রধান কারণ গল্পগুলোর বহুরৈখিকবিচ্ছুরণই নয় বারংবার পাঠ প্রয়োজনীয়তায়। হাতে শক্তিশালী কলম থাকলেই ভাল-মন্দ লিখে ফেলা যায় কিন্তু কথা-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। তার জন্য কী লিখব যেমন জানা দরকার তার থেকেও বেশী স্থির করা দরকার কী লিখব না। এই না লেখা, এটা একটা কঠিন সংগ্রামের পথ, সহজ জনপ্রিয়তার রাস্তাকে অস্বীকার করার পথ। এখানেই সাধন অনন্য। সমাজ-বিচ্ছিন্ন একজন ব্যক্তির ব্যতিক্রমী সমস্যা কোন কালেই তার গল্প-উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠেনি, কখনও তার রচনায় একজন ব্যক্তি গোটা সমাজের বিদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করে জিতে যাচ্ছে এমন তরল আশাবাদ স্থান পায়নি। অর্থাৎ কিনা সহজ জনপ্রিয়তার রাস্তায় তিনি হাঁটেন নি কখনও তাই ঐ রাস্তায় অন্ধগলিতে পথ হারিয়ে ফেলার মত দুর্ঘটনা তার জন্য ওৎ পেতে নেই। সাধন চট্টোপাধ্যায় তাই দীর্ঘ-কঠিন পথের পথিক, কিন্তু তার প্রতিটি পদক্ষেপই প্রমাণ করে বাংলা কথা-সাহিত্যের সত্য-পথ দেনটি। অতএব সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পাঠকদের কাব্যে হতাশার কোন স্থান নেই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com